জন্মশতবর্ষে : সরযূবালা

শম্পা ভট্টচার্য

বাংলাদেশে প্রাক্ স্বাধীনতা আমলে থিয়েটারে মেয়েদের অবস্থান সম্মানের ছিল না। আর আধুনিককালে যেমন এ নিয়ে উচ্চকিত কণ্ঠে নারী ও পুরুষ উভয়েই সোচ্চার হন, সেকালে এ সবের বলাই ছিল না। মহিলারা মঞ্চের বাইরে এবং ভেতরে সর্বত্র শোষিত হতেন। অভিনেত্রীরা সমাজের ভদ্রশ্রেণির অন্তর্গত ছিলেন না। অথচ উনিশ শতকের থিয়েটার ঠিক এমন এক ক্ষেত্র যেখানে মহিলাদের পেশাগত অস্তিত্ব এবং তাকে কেন্দ্র করে সমাজের interaction পরস্পরের মধ্যে জড়িয়ে মিশিয়ে ছিল। থিয়েটার ছিল সেই খোলা মঞ্চ যেখানে মেয়েদের দাম্পত্য জীবনের লাঞ্ছনা গঞ্জনা আবার পতিপ্রেমের গাঢ়তা, প্রেম মনস্তত্ব, বিবাহিত নারীর গৃহত্যাগ—এ সব কথা দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হত। এঁরা অনেকেই ছিলেন স্বামীপুত্র পরিবারে বিহীন একক নারী। বেশিরভাগ সময়ে কারো রক্ষিতা। বাবু বদল হত মাঝে মাঝে কখনো থিয়েটারের কারণে, কখনো বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। নানা বন্দর ছুঁয়ে যাওয়া জাহাজের মতো ভাসমান জীবন। কিন্তু এঁরা কেউ তথাকথিত 'বাজারের মেয়ে' কিংবা 'নাচনেওয়ালী' ছিলেন না। নাচ, গান আর মুজরো করা কিংবা বেশ্যাবৃত্তি করে জীবন কাটাতেন না। তবু সমাজের চোখে এইসব অভিনেত্রীরা ছিলেন অপাংক্তেয়। উনিশ শতকের শেষ ভাগ সারা পৃথিবীতে নারীর গার্হস্থায়নের যুগ। সুগৃহিণী হয়ে ওঠা তখন নারীর আদর্শ। নারীশিক্ষার তখন অন্যতম শর্ত ছিল সুষ্ঠুভাবে গৃহ পরিচালনা ও শিশুপালন। আর এই সব পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সামাজিক নাটকে গৃহলক্ষ্মী অন্নপূর্ণা আর সতী নারীর বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। থিয়েটারের মাধ্যমে জাতির সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে অভিনেত্রীদের ভূমিকা বড়ো কম ছিল না। এইভাবে তারাও বাঙালি সংস্কৃতি, চর্চার অঙ্গ হয়ে পড়ল। প্রদীপের আলোর নিচে থাকে একরাশ অন্ধকার। মঞ্চে আলোর বৃত্তে তাঁরা লেডি ম্যাকবেথ, মীরাবাঈ, জনা, রিজিয়ার মতো শক্তিশালী নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন আর তাঁরপর ফিরে যাচ্ছেন অপমানের গোলোকধাঁধাময় অন্ধকারে, অথচ য়ুরোপে তাদের সহযোদ্ধাদের চেয়ে এদেশের অভিনেত্রীদের গুণমান নেহাত কম ছিল না। কিন্তু রোজগার য়ুরোপের অভিনেত্রীদের চেয়ে কম ছিল। এই সব প্রাজ্ঞ অভিনেত্রীরা মঞ্চে দিনের পর দিন বিশুদ্ধ নারীর ছবি এঁকেছেন। অথচ নিজেরা সমাজে ব্রাত্য থেকে গেছেন। নাটকের পর নাটকে থিয়েটারের মেয়েরা দর্শকের কাছে সামাজিক মূল্যমান শিক্ষা দিয়ে গেছেন। অথচ তাঁরাই স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে প্রবেশের ছাড়পত্র পাননি। পূত চরিত্রে তাঁদের অভিনয়ে সমাজের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু মঞ্চের বাইরে এসে দাঁড়ালে নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠত। রামকৃষ্ণদেব পাপী বিনোদিনীর 'চৈতন্য হোক' আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু সে আশীর্বাদে বিনোদিনীর কাজের কোনো স্বীকৃতি বা প্রশংসা ছিল না, অথবা থাকলেও বাঙালি সমাজ বিনোদিনীর নৈতিক জীবনের উদ্ধারে প্রসঙ্গটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

বিংশ শতকের সূচনা পর্বে বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন যখন জোরদার হল, তখন নারীরা এ আন্দোলনের সূত্রে পথে নামলেন। দেশাত্মবোধক যে সব নাটক অভিনয় শুরু হল তাতে অভিনেত্রীদের মনেও দেশপ্রেমের জোয়ার বইতে লাগল। এই সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালার জীবনকাহিনি আলোচনা করলে দেখা যায় যে অভিনয়জীবনে ও ব্যক্তিজীবনে তাকে দুস্তর বাধা পার হতে হয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা-য় একটি সাক্ষাৎকারে প্রবীণ বয়সে তিনি বলেছিলেন: 'আমাদের সময়ে মেয়ে হয়ে জন্মালে তার জন্ম সাল তারিখ টুকে রাখার রেওয়াজই ছিল না। ওই যাকে বলে, মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই তো একরকমের অভিশাপ। হ্যাঁ, তখনকার দিনের সংসারে মেয়েদের ওইরকম চোখেই দেখা হত। সেইরকম ভাবেই আমারও জন্ম হয়েছিল।' যা হতে পারত অভিশপ্ত জীবন, তা সকলের ভালোবাসায় আপ্লুত হয়েছে সারাজীবন। সরযূবালার জন্ম দক্ষিণেশ্বরের এঁড়েদায়। বাবা ভূতনাথ দত্ত। জমিজমা নিয়ে মামলা মোকদ্দমায় হেরে তিনি সর্বস্বান্ত হন। বাবা রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলতেন। গান পাগল মানুষ ছিলেন। আধ্যাত্মিক গান শোনানোর জন্য তাঁর ডাক পড়ত এখানে ওখানে। সরযূবালার ভাষায় : 'আমার গানের প্রতি ঝোঁক ওই বাবার কাছ থেকেই।' ছোট্ট সরযূর পৃথিবী ছিল বাবাকে কেন্দ্র করে। যাকে বলে বাপ-ন্যাওটা তাই। তাই হয়তো সরযূ এমিনেন্ট থিয়েটারে কুমার সিংহ নাটকে ভিক্ষুক বালকের চরিত্রে আধ্যাত্মিক গান 'আপন বলে তুই কারে ভাবিস মন, কেউ তো নয় আপন' —গান গেয়ে মঞ্চের উপর বাবার কথা মনে করে কেঁদে ফেলেছিলেন। রৌপ্যপদক পেয়েছিলেন এই অভিনয়ে। তিনি যেখানে থাকতেন তাঁর চারপশের প্রকৃতি সবুজে ভরা, জন্মের পর থেকে চারপাশে ছোটো ছোটো বাড়ি ঘর, গাছপালা, সবুজ ফুল ফলে বাগানে ঘেরা পাখি ডাকা গ্রাম দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন সরযূবালা। দক্ষিণেশ্বরের নবহতখানার সামনে মা সারদা যেখানে স্নান করতেন সেই মেয়েদের স্নানের ঘাট, বকুল গাছ, বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথা আরো অনেক স্মৃতি ছিল তাঁর মনে। পঞ্চবটীর ফল আর ফুলের বাগান, ফুলের সৌরভে আকুল হওয়া মন, চারপাশে নির্জনতা আর স্তব্ধতার মধ্যে পাখির মিষ্টি সুরে ডাক, ফুলের গন্ধ, গঙ্গার মন জুড়ানো ঠান্ডা হাওয়া—প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য সরযূর শিল্পীমনকে সমৃদ্ধতর করেছিল।

আর সরযূবালা যখন শৈশবে দক্ষিণেশ্বরে এমিনেন্ট থিয়েটারে ছোটোখাটো চরিত্রে অভিনয় করে চলেছেন, সে সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রে মেয়েরা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করছে। ১৯২৮ খ্রি. মহিলা রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। লতিকা ঘোষ, এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার মেয়েরা নারী সত্যাগ্রহ সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। এসব ঘটনার পর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে আলাদা নারী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য সভা হয়। সরলাদেবী চৌধুরানী সেই সভায় মেয়েদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত এবং আইনগত অধিকারের জন্য জোর দিলেন। আর এই পালাবদলের প্রেক্ষাপটে বাংলার মঞ্চাকাশে সরযূবালা দেবীর আবির্ভাব। এই পরিবর্তনের ছোঁয়া সরযূবালার জীবনে ও অভিনয়ে লেগেছিল কিন্তু তা অনেক পরে।

নির্মলেন্দু লাহিড়ী ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ মিত্র থিয়েটার বন্ধ হলে অভিনেতা ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার খোলার ইচ্ছায় ভালো অভিনেত্রীর খোঁজে যখন সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সে সময়ে দক্ষিণেশ্বরে এমিনেন্ট থিয়েটারে চন্দ্রশেখর নাটকে শৈবলিনীর ভূমিকাভিনয়ে সরযূকে দেখে মুগ্ধ হলেন। শৈবলিনী চরিত্রে যে কী যাদু আছে কে জানে। আরও একবার ওই চরিত্রে তারাসুন্দরীর রূপদানে মুগ্ধ হয়েছিলেন ক্ল্যাসিক থিয়েটারের অভিনেতা

পরিচালক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। অমরেন্দ্রনাথের সে মুগ্ধতা বহুকাল পর্যন্ত বজায় ছিল। কিশোরী সরযূ। বেঁটে খাটো, মুখ চোখ শাণিত নয়। শরীর ক্ষীণ, কিন্তু অভিনয়ে অসাধারণ। পূর্ববঙ্গে ওই নাট্যদলের সঙ্গে গিয়ে সরযূবালা প্রফুল্ল, দুর্গা, ষোড়শী নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করেন। অর্থের প্রয়োজনে নয় বছর বয়স থেকে অভিনয় করেছেন বালিকা সরযূ। ছেলেবেলায় ঝামাপুকুর গার্লস স্কুলের পড়াশুনায় ইতি টানতে হল ওই কারণে। আধুনিক কালের পরিভাষায় শিশুশ্রমেই তাঁর জীবনের সুচনা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে শারদীয় রূপমঞ্চ পত্রিকার সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়ের 'পার্থিবের দপ্তর' বিভাগে প্রকাশিত সরযূবালার সাক্ষাৎকার ভিত্তিক রচনায় আছে তাঁর বাল্যকালের অভিনয়ের স্মৃতি: 'ছোটোবেলায়ই সরযূর অপূর্ব কণ্ঠমাধুর্য অনেককেই মুগ্ধ করে। শুনে শুনে গান শেখার চাতুর্য বিস্মিত করে তোলে। লেখাপড়া শেখবার আগ্রহও ছিল তাঁর প্রবল। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ বর্ষার আগে সরযূবালা ব্রহ্মদেশে নাট্যসফর শেষ করে ফিরে এলেন কলকাতায়। মনোমোহন থিয়েটার আবার খোলা হলে নির্মলেন্দু লাহিড়ী শেষ পর্যন্ত সরযূবালার জীবনসঙ্গী হয়ে উঠলেন। কিন্তু সারা জীবন এই নারীর সঙ্গে রইলেন না, সন্তানসহ সরযূকে ত্যাগ করে মাঝপথে দাম্পত্যজীবনের সীমারেখা টানলেন। গিরিশ ঘোষের পুত্র দানীবাবু অবশ্য চিরকাল সরযূর শুভৈষী ছিলেন। ভালো নাটক করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। মীরাবাঈ তেমন ভালো না চললেও দর্শকমনে সরযূর অভিনয় রেখাপাত করেছিল। এরপর মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হল বঙ্কিমচন্দ্রের মঞ্চসফল নাটক বিষবৃক্ষ। সরযূবালা-কুন্দনন্দিনী, তারাসুন্দরী-সূর্যমুখী, কুসুমকুমারী-কমলমণি অল্পবয়সি মেয়েটির সঙ্কোচ বিহ্বলতায় লেখকের সৃষ্ট চরিত্র সরযূর অভিনয়ে প্রাণ পেয়েছিল। প্রবীণ বয়সে একটি সাক্ষাৎকারে সরযূবালা এই নাটকের প্রথম শোয়ের অভিজ্ঞতায় বলেছেন : 'বাইরে দর্শকদের অভিনন্দন, আর মঞ্চে আমি পেয়েছিলাম আর এক মহার্ঘ পুরস্কার। শেষ দৃশ্য ছিল নগেন্দ্রর কোলে মাথা রেখে মারা যাচ্ছে কুন্দনন্দিনী স্বয়ং নগেন্দ্র, আমার প্রথম নায়ক। তাঁর কোলে মাথা দিয়ে পড়ে আছি। ড্রপসিন পড়ে গেছে আমরা দুজনে একই ভঙ্গিতে রয়ে গেছি। দানীবাবু আমার মাথা কোলে নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। হঠাৎ আচ্ছন্নের মতো আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আমি তোকে আশীর্বাদ করে বলছি তুই একদিন মস্ত বড়ো অভিনেত্রী হবি। সারাদেশে তোর নাম ছড়িয়ে পড়বে। দর্শকরা তোর অভিনয় দেখে ধন্য ধন্য করবে।' দানীবাবুর আশীর্বাদ মিথ্যে হয়নি সরযূবালার জীবনে। তারপরের নাটক দক্ষযজ্ঞ। সরযূবালা সতী, দানীবাবু মহাদেব। নায়ক ও নায়িকার মধ্যে বয়সের অনেক ব্যবধান। তবু দুজনের অসাধারণ অভিনয়ে compatibility তৈরি করে নিয়েছিলেন তাঁরা, অবশ্য খবরের কাগজগুলিতে বয়সের ব্যবধান নিয়ে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছে। বিষবৃক্ষ নাটক সম্পর্কে নাচঘর পত্রিকায় কার্টুনে বলা হয়েছিল: 'দানীবাবু-তুমি আমায় কতখানি ভালোবাস। সরযূ –তোমার সঙ্গে আমার বয়সের তফাত যতখানি।' নিঃসন্দেহে এই অভিনয় সেকালের সমালোচকদের ভাবিয়ে ছিল তাই এই কার্টুনের অবতারণা।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে মনমোহন থিয়েটারে পথের শেষে নাটকে পারুলের ভূমিকায় অভিনয় করেন সরযূবালা। এ নাটকে পারুলের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের অন্যতম দর্শক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। অহীন্দ্র চৌধুরীর এ-অভিনয় তেমন ভালো লাগেনি। সত্যি কথা বলতে কি, অহীন্দ্র চৌধুরীর নিজের হারায়ে খুঁজি বইটিতে সরযূবালার তেমন উল্লেখ নেই বললেই চলে। অথচ অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর সঙ্গে অনেক সুবিখ্যাত নাটকে অভিনয় করেছেন। পারুলের অভিনয় সম্পর্কে নাচঘর পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছিল। আর অভিনয়ের সঙ্গে সরযূ তখন ব্যক্তিজীবনে ঘর বেঁধেছেন তাঁর নাট্যগুরু নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সঙ্গে, গোঁসাই বাগানের বাড়িতে। অবশ্য লাহিড়ী মহাশয়ের মামাতো ভাই দিলীপকুমার রায় ছাড়া সে বাড়িতে শ্বশুরবাড়ির কেউ যাতায়াত করত না, অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অভিনয়কে অসাধারণ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারতেন সরযূবালা। তাই আবর মনোমোহন মঞ্চে সুযোগ্য নায়িকাকে পেয়ে পুরোনো নাটকের অভিনয় শুরু করলেন দানীবাবু, প্রফুল্ল, বলিদান, চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, গৃহলক্ষ্মী–এসব নাটক অভিনয় হয়ে চলল। কিন্তু এগুলি শুধুমাত্র রিমেক ছিল না, সরযূবালার অভিনয় তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারীর অভিনয়ের হুবহু অনুকরণ নয়। নতুন যুগের নতুন ভাবনায় চিত্রিত হল এসব চরিত্র, নেহাৎ সাধারণ চেহারার একটি মেয়ে। অসাধারণ কোনো সৌন্দর্য নেই, সযত্ন চেষ্টা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন সেকালের নাট্য সমাজে। অভিনেতা দিলীপ রায়ের মতে ঝর্নার মতো ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। যা শ্রব্য তা লিখে ওঠা দায়, কোন অভিনয় কেমন ছিল, তা বর্ণনা করা ভারি কঠিন। কেননা পাঠককে তা দেখানো যায় না। পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয়, সরযূবালার কণ্ঠস্বরের চাকচিক্য ও কারিকুরি ছিল মনে রাখার মতো। তাঁর করুণ রসাত্মক অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য হল দ্রুত কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন করে হঠাৎ একটা কুলহারা আর্তনাদের মতো তা ভেঙে পড়া। একটা বুকফাটা বেদনার হাহাকার যেমন ছড়িয়ে পড়ত সর্বত্র।

মনোমোহন নাট্য মন্দিরে আলোড়ন তুলেছিল রক্তকমল নাটক, প্রথম অভিনয় হয় ১৯২৯ সালের ১ জুন। লেখক প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সেকালের চার পাঁচ ঘন্টার পরিবর্তে এটি ছিল সওয়া দুঘন্টার নাটক। 'পুরুষের বেলা লীলাখেলা/পাপ লিখেছ নারীর বেলা' –এইরকম একটি প্রতিবাদ করে নাটকটি লেখা। পতিতার মানবিকতা এ নাটকের বিষয়। এই চরিত্র অভিনয়ের সময়ে সরযূ সতেরো বছরের মেয়ে। তিনি পরে ওই নাটক সম্পর্কে বলেছেন: 'যতদূর মনে পড়ে ওই সময় শচীনদার প্রথম সামাজিক নাটক রক্তকমল-এ একটি বিশিষ্ট চরিত্রে আমি অভিনয় করি। চরিত্রটি খুবই অন্তর্দ্বন্দ্বময় ও মনস্তত্ত্বমূলক ছিল। সেই যুগে কোনো সামাজিক নাটকে অমন একটি নাট্যচরিত্র আমি পাইনি। সম্ভবত পেশাদারি মঞ্চে, সামাজিক নাটকে ওই জাতীয় নাট্য চরিত্র এই প্রথম।' ('পড়ন্ত আলোয় শচীন্দ্র স্মৃতি' সরযূবালা দেবী, শচীন সেনগুপ্ত জন্মশতবর্ষ স্মরণিকা, প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩)। এই নাটকে সরযূবালা অর্থাৎ মমতা সাজানো সংসার ত্যাগ করে নতুন সুখের সন্ধানে পথে বেরিয়েছিল। পতিতপ্রসন্ন তার সঙ্গী। মোহভঙ্গ যখন হল, শুরু হল তীব্র অনুশোচনার পালা। গ্লানিময় জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সে নিখাদ সোনা হয়ে উঠল। মঞ্চে এই চরিত্রটির মদ্যপানের দৃশ্য আছে। রক্তকমল নাটকটি বেশিদিন না চললেও মমতা চরিত্রটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সম্ভবত চারপাশের সঙ্গিনী যে সব দুঃখময়ী অথচ পবিত্র নারীদের সরযূবালা দেখেছিলেন তারা মূর্ত হয়েছিল তাঁর অভিনয়ে।

মনোমোহনের পরের নাটক প্রাণের দাবী। দানীবাবু সরযূবালাকে অচলায় ভূমিকায় মনোনীত করলেন। বেঙ্গলী পত্রিকায় লিখেছিল : 'Miss Sarajubala in the role of Achola were also quite remarkable'. লক্ষনীয় যে এই সময়ে তিনি নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সঙ্গে ঘরকন্না করেছেন।

কিন্তু বিবাহ করলে অভিনেতা অভিনেত্রীদের দাম কমে যেত হয়তো। তাই Sarajubala বিজ্ঞাপনে Miss রয়ে গেছেন। আর এ বিবাহ গোপনে ঘটেছিল– ছয় সাতজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে, কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে। মনোমোহন থিয়েটারের অন্যান্য অভিনয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাহাঙ্গীর নাটক, প্রথম অভিনয়, ১৯২৯, ২৫ ডিসেম্বর। লায়লীর ভূমিকায় সরযূর অভিনয় সম্পর্কে বলা হয়েছিল: 'Sarajubala impressed all as laili.' আবার মনমোহন থিয়েটারে সাজাহান নাটকে দানীবাবুর কথায় স্বল্পমাত্র রিহার্সালে জাহানারার ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল। নির্মলেন্দু লাহিড়ী রাজি হয়নি। সরযূবালা বলতেন: 'দর্শকই আমার কাছে প্রথম ও শেষ কথা, তাঁদের দেওযা পুরস্কারই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। জাহানারার চরিত্রে একশতবারের বেশি অভিনয় করেছি। 'সাজাহান' ছিল আমাদের ব্ল্যাঙ্ক চেক। নাটক নামলেই তিন হাজার টিকিট তা বিক্রি হবেই।' ('সরযূবালা দেবী'/ সুনেত্রা ঘটক, বহুরূপী, ০২ অক্টোবর ১৯৯৪, সম্পাদক : কুমার রায়) থিয়েটারে তার গানের গুরুদের অন্যতম ছিলেন কাজী নজরুল তাঁকে নানারকম বুঝিয়ে সুঝিয়ে কখনো নিজের পানের কৌটো থেকে পান খাইয়ে, পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাকে গান শোনাতেন। আর সরযূবালা নানা আবদারে অভিমানে তাঁকে মাঝে মাঝে বিব্রত করতেন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মনোমোহন নাট্যমঞ্চে মহুয়া নাটক অভিনীত হয়। এ নাটকে সংগীত শিক্ষক কাজী নজরুল ইসলাম। নাটকের নামভূমিকায় সরযূবালা। নাচে গানে অভিনয়ে জমজমাট প্রেমের নাটক জমে গেল। লোকনাট্যকে বাংলা নাটকের ইতিহাসে ব্যবহার করা হল এ অভিনয়ে। এ নাটককে সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে সরযূবালার জুড়ি ছিল না। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ১৫ জানুয়ারি নাচঘর পত্রিকা লিখেছিল : 'শ্রীমতী সরযূবালার মহুয়া যে কত সুন্দর হয়েছে, সকলকেই তা দেখতে অনুরোধ করি। এই নবীনা নটীর শক্তি আমাদের বিস্মিত করেছে। এতটুকু দেহের ভিতরে এমনভাবে প্রকাশের শক্তি যে গোপন থাকতে পারে না দেখালে বিশ্বাস করা শক্ত। বলতে কি সমগ্র অভিনয়ের ভিতরে প্রধান জয়মাল্য তাঁরই প্রাপ্য।' নাচে গানে সরযূবালা তেমন পারদর্শী নন। কিন্তু এই নাটকে দক্ষভাবে সব সামাল দিয়েছেন তিনি। অভিনয়ের গুণে গুরু নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সহনায়ক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে ছাপিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

চিরকাল সরযূ অসম্ভব বিনয়ী। কোথাও এতটুকু অহংবোধ নেই। সহকর্মীদের সম্পর্কে প্রশংসা করতেন না বলে অপরিসীম দুঃখ ও বেদনা অনুভব করতেন সরযূবালা। তাঁর এই ছাপিয়ে যাওয়া লাহিড়ী মশাইয়ের কেমন লেগেছিল তা আজকের দিনে জানাতে ইচ্ছে হয়। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেও জীবনের পরবর্তী পর্বে সন্তানদের মানুষ করতে গিয়ে বহু দুঃখের পথ পার হয়েছেন তিনি। অভিনেত্রীদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এক দিকে পেশার জগতে দৈনন্দিন অবমাননা, নষ্ট চরিত্রের মেয়ে বলে ছাপ দেওয়া – অন্য দিকে পয়সা রোজগারের যন্ত্র হিসাবে বাড়ির লোকের ব্যবহার– এই অভিজ্ঞতা পুরোনো কালের অভিনেত্রীদের জীবনপথের পাথেয় ছিল। দর্শক হিসাবে রাজা মহারাজাদের চেয়ে গুণী ব্যক্তিদের থিয়েটারে আসা যাওয়া তারা যেন কেন পছন্দ করতেন– তা সহজে অনুমেয়। উনিশ শতকের শেষে সাংস্কৃতিক জাতি গঠনের তাগিদ মধ্যবিত্ত হিন্দু মেয়েকে হিন্দু গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের সনাতন দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। বিশ শতকের গোড়ায় রাজনৈতিক জাতি তাগিদ তাকে ঔপনিবেশিক প্রভুর বিরুদ্ধে প্রকাশে পথে নামার অনুমতি দিল। সেটাও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অনুমতিক্রমে জাতীয়তাবোধের উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন অভিনেত্রীরাও। তাদের বলা হল অভিনয়ই তোমার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আর এভাবে শচীন সেনগুপ্তর গৈরিক পতাকা নাটক দর্শকদের স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

এ নাটকের প্রথম অভিনয় ২৮ জুন, ১৯৩০। তখন সারা দেশের আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে শুর হয়েছে শাসকের তান্ডবলীলা ও অত্যাচার। এ নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে আপন জীবনীচিত্র তৈরি করার সময়ে মন্তব্য করেছিলেন সরযূবালা: 'মনে হত না যে আমি থিয়েটার করছি। মনে হত স্বাধীনতার যুদ্ধে নেমেছি।' সরযূবালার অভিনয় দেখে সুভাষচন্দ্র বসু দেশপ্রেমের আবেগে আপ্লুত হয়েছেন। থিয়েটার থেকে রাজনৈতিক চেতনা সংগ্রহ করেছেন অভিনেত্রীরা। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ শারদীয় রূপমঞ্চএ শ্রী পার্থিবের দপ্তরে একটি সাক্ষাৎকারে সরযূদেবী বলেছেন: 'আমি আমার অভিনয়ের মধ্য দিয়েই দেশ সেবার গৌরব অনুভব করি। রাখুক, যাঁরা আমাদের অপাংক্তেয় করে রাখতে চায়।' সময়টা তখন দ্রুত বদলাচ্ছে। তাই বিনোদিনীর মতো অভিনেত্রীদের বেহাল অবস্থা নিয়ে করুণ আর্তি নয়– অস্পৃশ্য করে রাখার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন সাহসী, জেদি, তেজালো অভিনেত্রী সরযূবালা। স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে সরযূ মোটা খদ্দরের শাড়ি পরতেন। মিশরকুমারী নাটকে হত। তাঁকে কাটা শিখিয়েছিল নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত। গৈরিক পতাকা নাটকের একটি দৃশ্য বরাবর সরযূদেবীকে শিহরিত করেছে নাটকের মধ্যে ছিল বন্দে মাতরম ধ্বনি। নাটকের শিল্পী থেকে প্রমটার লাইটম্যান, সিফ্টার, সব টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে দর্শকরাও বন্দেমাতরম্ বলে গর্জে উঠত। মন্মথ রায়ের কারাগার ও দেশাত্মবোধক নাটক। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ ডিসেম্বর প্রথম অভিনয় রজনী, এটি ১৫/২০ রজনী অভিনয়ের পর নাটক দেখতে এল ইংরেজ দর্শক। প্রথম দুটি রাতে তারা, প্রোডিউসার প্রবোধচন্দ্র গুহ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, উনি আর কাজী সাহেব অর্থাৎ নজরুল ইসলাম ঠিক করে নিলেন নাটকের কোন্ কোন্ জায়গা বাদ দেওয়া হবে। সরযূকেও বলা হল– 'সংলাপ বাদ দাও, গান বাদ দাও'। নজরুল বলেছেন– 'ওরে মরে যাবি। দেখছিস না, লালমুখোরা সব বসে আছে সামনে।' সরযূবালা বলেছেন– 'আমি বলি, মরব। কি হবে ধরে নিয়ে যাবে তো?' পুরুষেরা ভয় পেয়েছিলেন। সরযূ হয়তো নয়। শেষ পর্যন্ত অভিনয়ে কিছু অংশ বাদ পড়লেও কারাগার নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। নাটক সম্পর্কে সরযূবালা বলেছেন : 'কারাগার অভিনয় হবে। ওই মনমোহন থিয়েটারেই। এটা আমাদের কাছে তখন আর অভিনয় নয়, রীতিমত মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম। মনোমোহন থিয়েটার ছিল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে। প্রথম অভিনয় রজনীতে লোক জমে ভেঙে পড়ছে। সে কী উন্মাদনা। মূল দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা মাঝে মাঝে পর্দার ফাঁক দিয়ে ভিড়ের সেই চেহারা দেখে আরও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছি।...এই জাগরণ দেখে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছি। তখন আমরা আর কেউ অভিনেতা অভিনেত্রী নই, প্রত্যেকেই স্বাধীনতার সৈনিক।' (আজকাল, ২৯/১২/১৯৯১) 'সিনেমার চেয়ে নাটককেই আমি বেশি ভালোবেসেছি' সাক্ষাৎকার : চন্ডী মুখোপাধ্যায়), গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর উদ্দেশ্যে পঠিত শোকলিপিতে অভিনেত্রী সুশীলাবালা বলেছিলেন যে, 'হায় আমাদের কপাল। চিরদিন মনে বড়ো অনুতাপ এই যে নিরুপায় হয়ে আমাদের সাহচর্যে ভদ্র অভিনেতাগণ সমাজের চক্ষে ঘৃণিত হয়ে

রয়েছেন।' তার থেকে অনেক দূরে সরে এসে সরযূবালা সহ অভিনেতাদের সঙ্গে 'স্বাধীনতার সৈনিক' হিসবে fellow feeling তৈরি করে নিচ্ছেন অনায়াসে। পুরুষতান্ত্রিকতার বিরাট মহীরুহ ও তার ছায়াকে পিছনে ফেলে রেখে, অথচ একমুখ ঘোমটা টেনে সে সময়ে রোজ উঠেছেন গাড়িতে ন্যাট্যশালার উদ্দেশ্যে। দুর্মুখের অপপ্রচার আর নিন্দা যাতে মাথা না তুলে দাঁড়াতে পারে তাই পোশাকে আসাকে রক্ষণশীলতা বজায় রেখেছেন তিনি। কিন্ত মনে ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা।

নির্মলেন্দু লাহিড়ী ছাড়াও অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে অভিনয় করেছেন। সরযূবালা, তাঁর 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতার আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন উদয়শঙ্কর। ফিল্মের থেকে নাটকে অভিনয় করতে সরযূবালা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ৮ই আগস্ট রঙমহলে নতুন নাটক উদ্‌বোধন হল শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া। শারীরিক অসুস্থতা বশত 'নারায়ণী' নামে একটি চরিত্রে সামান্য ভূমিকা ছিল তাঁর। সেই সামান্য ভূমিকায় অসামান্য অভিনয়ের ফলে চরিত্রটির ব্যাপ্তি নিয়ে লেখকের অবিচারের প্রশ্ন তুলেছিলেন সমালোচকরা। তাহলে সরযূর অভিনয়ের দক্ষতা নাট্য কাঠামো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে একথা ভাবা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। আবার ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে অনুরূপা দেবীর মা নাটকে নাট্য নিকেতনে সরযূবালা বারো বছরের বালক অজিতের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করতেন। সরযূবালার ক্ষমতা দেখে প্রবোধচন্দ্র গুহ—নাট্যকার মন্মথ রায়কে নায়িকা নির্ভর নাটক লিখতে অনুরোধ করেন। রচিত হয় খনা নাটক। ১৯৩৫ সালে ১১ জুলাই নাট্য নিকেতনে উদ্‌বোধন হল খনা। নাম ভূমিকায় সরযূবালা। অনবদ্য অভিনয়। এবাবেই চলতে থাকে নাট্য অভিনয়ের পালা, বভ্রুবাহন, সাজাহান সোনার বাংলা, সতী তুলসী দেবদাস, ধাত্রী পান্না এই সব নানা নাটকে মাইলস্টোন তৈরি করার পর অভিনয় করলেন স্টার থিয়েটারে শ্যামলী নাটকে, দর্শকের কাছে সহানুভূতিহীন শ্বাশুড়ি সরলা চরিত্রে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এই নাটকে রিটিশ অভিনেতা সিবিল থর্ণডাইক সরযূবালার অভিনয় দেখে প্রশংসা করেন। প্রবীণা সরযূবালা মঞ্চে বহুবার অভিনয় করে গেছেন। আবার নতুন শিল্পীর অভিনয়ের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করতেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁকে ছেঁড়া তার নাটক দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সরযূবালার স্মৃতি অনুযায়ী এটি তাঁর দেখা প্রথম গ্রুপ থিয়েটার। তাঁর ভাষায়: 'শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র দুজনেই অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এ নাটকে অভিনয়ের ক্ষেত্রে, ক্ল্যাসিকাল নাটকে অভিনয়ের ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্র যে ধাদ্দরা অনুসরণ করতেন তার সঙ্গে শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় ধারার মিল আছে। তৃপ্তিও প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিল।' ('কাজিদার কাছে গানের তালিম নিয়েছিলাম', আনন্দবাজার পত্রিকা, (২০.০৪.১৯৯৩)। ভালোমানুষ দেখেছিলেন সরযূদেবী। নান্দীকারের অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয় তাঁকে মুগ্ধ করত। আর প্রচুর বই পড়তেন। নাট্যচরিত্র বুঝতে গেলে মূল বইটা পড়া দরকার। গুরু নির্মলেন্দু লাহিড়ী এই উপদেশের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর বিভিন্ন লেখকদের উপন্যাস পড়তেন তিনি। এ অভ্যাস তার বরাবর বজায় ছিল। আর দেখতেন বিদেশি সিনেমা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সংগীত নাটক অকাদেমি পুরুষ্কার লাভ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আরও অনেক পুরস্কার ও সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন বারবার।

সংসদ প্রকাশিত বাংলা নাট্য অভিধানে বলা হয়েছে বিখ্যাত অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ী সরযূবালার স্বামী। স্বামীর পরিচয়ে তিনি পরিচিত ছিলেন না। কৃতী মানুষ হিসেবে তাঁর স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল। তবু তাঁর মারা যাওয়ার পর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ীর স্ত্রী হিসেবে তাঁর একটা স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সন্তানও আছে, লাহিড়ীমশাই কিন্তু সরযূবালাকে ছেড়ে আবার বিবাহ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে নিজেদের সন্তানদের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করেছেন। এমনকি ১৯৫৯ খ্রিস্টাদে ২৯ ফেব্রুয়ারি কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত নির্মলেন্দু লাহিড়ীর মৃত্যুসংবাদে স্ত্রী হিসাবে সরযূর কোনো পরিচয়ের উল্লেখ ছিল না। তাতে চূড়ান্ত বেদনাহত হয়েছিলেন সরযূদেবী। দাম্পত্য জীবনের মাঝপথে ইতি টেনে বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচারণের বিরুদ্ধে সরব হয়ে সন্তানদের বড়ো করে তোলার একক দায়িত্বভাব নিয়েছিলেন তিনি। কাজের জগতেও দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। কখনও কোনো খোলা মঞ্চে দাঁড়িয়ে নাট্যশিক্ষক, অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে ছোটো করেননি তিনি। নিমলেন্দু লাহিড়ীও অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন, এই বিচ্ছেদে দর্শক তাদের অসামান্য যুগল অভিনয় দেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। এটা তাঁর চরিত্রের সমুন্নতির পরিচয়। অভিনয় জগতে সেকালে পুরুষবিহীন ভাবে একা ঘোরাফেলা করা সহজ কথা ছিল না। সেই ঘোরাফেরা বজায় রেখে 'নাট্যসম্রাজ্ঞী' বিশেষণ লাভ করা কিংবা সবার 'সরযূ-মা' হয়ে উঠতে কাঁটাতারের বেড়া তাঁকে পার হতে হয়েছে বারবার। সসম্মানে সেসব বাধা পার হয়ে তিনি আধুনিক অভিনেত্রীদের অভিনয় পেশার পথটি করে দিয়ে গেছেন। এভাবেই বাংলা নাটকের অভিনয়ের জগতে তিনি হয়ে উঠেছেন শতাব্দীর উজ্জ্বল নক্ষত্র। কথায় আছে দেহপট সনে নট সকলি হারায়।' সরযূবালার জন্মশতবর্ষের সূচনা হয়েছে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ২২ জুলাই সরযূবালা পৃথিবী ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর নশ্বর দেহ আমাদের মাঝে নেই। চারপাশে প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে নাট্যপেশায় সম্রাজ্ঞী হয়ে ওঠার অটুট শক্তি কেমন করে তাঁর জীবনের মাঝে সঞ্চারিত হল— আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, উত্তরসূরি সকলের কাছে কেমন করে দরিদ্র ঘরের মেয়েটি তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান কড়াগন্ডায় আদায় করে নিলেন— সে সব কথা ভবিষ্যতের মানুষের চিরকাল অনুপ্রেরণা জোগাবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

গ্রন্থাদির তথ্যসূত্র:

১. রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী, অমিত মৈত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ২০০৪

২. সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান, সম্পাদক, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, জানুযারি ২০০০।

৩. ওঁরা, আমরা, এর শোভা সেন, ধীমা কলকাতা ২০০০।